একুশের ঢেউ EKUSHER DHEU

ISSN: 2454-7182
IMPACT FACTOR: 8.158

An International Online Indexed Research Journal of Language, Literature and Culture covering Arts & Humanities as a broad area (Peer-reviewed, Refereed Journal, Quarterly)

River pollution and environmental crisis in Kinnar Roy's novel 'Brahma Kamal': Ecocritical analysis

কিন্নর রায়ের ‘ব্রহ্মকমল’ উপন্যাসে নদী দূষণ ও পরিবেশ সংকট: ইকোক্রিটিক্যাল বিশ্লেষণ

Name of the Author: **SONALI KUNDU**

Affiliation: **Ph.D. Research Scholar, Bengali Department, Visva-Bharati, West Bengal, India**

Abstract: This research paper examines the profound ecological discourse in Kinnar Roy’s significant Bengali novel Brahmakamal (2009) through the lens of Ecocriticism. Moving beyond the traditional romanticized portrayal of nature, Roy shifts the narrative toward a critical analysis of civilizational survival. The study focuses on the acute existential crisis of the Saraswati River—specifically the ‘Bengali Saraswati’ of the Howrah-Hooghly region—while exploring the systemic decay of vital waterways due to industrial effluents and human encroachment. By integrating local riverine decline with global environmental threats like global warming (supported by IPCC/WMO data) and biodiversity loss, the paper highlights Roy’s visionary warning about the impending collapse of human civilization. Through the analysis of ‘eco-centric’ characters and the personification of the river as a ‘living entity’, this study underscores the novel’s role as a powerful environmental document. The analysis concludes that Brahmakamal provides a crucial ethical framework for re-establishing a sustainable relationship with the environment in the 21st century.

Keywords: Ecocriticism, Kinnar Roy, Brahmakamal, Riverine Pollution, Global Warming, Bengali Fiction, Environmental Awareness, Eco-text, Wildlife Poaching, Ecological Ethics.

কিন্নর রায়ের ‘ব্রহ্মকমল’ উপন্যাসে নদী দূষণ ও পরিবেশ সংকট: ইকোক্রিটিক্যাল বিশ্লেষণ

সোনালী কুণ্ডু

প্রকৃতি ও পরিবেশ শব্দ দুটিকে আমরা প্রায়ই এক করে ফেলি, কিন্তু এদের মধ্যে এক সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। প্রকৃতি হলো সেই অনাদি জগত যা মানুষের তৈরি নয়; পক্ষান্তরে, প্রকৃতি আর মানুষের জীবনযাত্রা মিলেমিশে যা তৈরি হয়, তা-ই হলো আমাদের চারপাশের পরিবেশ। আদিতে এই দুটির মধ্যে একটি সুন্দর বোঝাপড়া থাকলেও বর্তমানে উন্নয়নের চাপে সেই ভারসাম্য ভেঙে পড়েছে। বিশ্বায়ন আর প্রযুক্তির দাপটে আজ বাতাস থেকে মাটি—সবই যেন বিষে ভরে উঠছে। এর ফল শুধু গাছপালা বা পশু-পাখি ভোগ করছে না, খোদ মানুষের অস্তিত্বই আজ বড়সড় সংকটের মুখে। বিভিন্ন পরিসং খ্যানে দেখা যাচ্ছে, গত কয়েক হাজার বছরে আমাদের বনভূমির পরিমাণ আশঙ্কাজনকভাবে কমেছে। বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় বিশ্ব উষ্ণায়ন এখন আর কোনো দূরের সম্ভাবনা নয়, বরং এক রূঢ় সত্য। এর ফলেই দেখা দিচ্ছে আইলা বা সুনামির মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং বারবার হানা দিচ্ছে অতিমারি। বিজ্ঞানীরা সতর্ক করছেন যে, দূষণ এভাবেই বাড়তে থাকলে সমুদ্রের জলস্তর বেড়ে যাবে এবং সুন্দরবনের মতো নিচু এলাকাগুলো অচিরেই সমুদ্রের গর্ভে হারিয়ে যাবে।

মানুষের এই অত্যাচারে বিপন্ন প্রকৃতি ও প্রাণিজগতের প্রতি সচেতনতার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ১৮৬৬ সালে Ernest Haeckel বিজ্ঞানচর্চার একটি শাখা হিসেবে ‘ইকোলজি’-কে জনসমক্ষে নিয়ে আসেন। পরবর্তীকালে ১৯৭২ সালের স্টকহোম সম্মেলন এবং ১৯৯২ সালের ‘বসুন্ধরা শীর্ষ সম্মেলন’ (Earth Summit) -এর মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষার বৈশ্বিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষায় সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনের সমান্তরালে সাহিত্যের ভূমিকাও অনস্বীকার্য। সংবেদনশীল সাহিত্যিকরা তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে প্রকৃতির প্রতি মানুষের বিরূপ আচরণ এবং পরিবেশগত সংকটের সেই রূঢ় বাস্তবকে নিপুণভাবে ফুটিয়ে তোলেন। তাঁদের এই শিল্পভাবনা ও পরিবেশ সচেতনতাই বিচিত্র সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়ে সার্থক রূপ পেয়েছে। প্রকৃতি ও পরিবেশের এই সংকটের ভাবনা নিয়ে লেখা সাহিত্যকে আজ ‘ইকো-টেক্সট’ বা পরিবেশবাদী সাহিত্য বলা হয়। আর এই সাহিত্যের তাত্ত্বিক আলোচনার নাম হলো ‘ইকোক্রিটিসিজম’ (Ecocriticism)। ১৯৬২ সালে প্রকাশিত Rachel Carson-এর ‘Silent Spring’ গ্রন্থটি এই জাতীয় রচনার আদি নিদর্শন হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা কৃষিকাজে ব্যবহৃত রাসায়নিকের ক্ষতিকর প্রভাব প্রথম সবার সামনে আনে। ১৯৭৮ সালে William Rueckert তাঁর ‘Literature and Ecology: An Experiment in Ecocriticism’ প্রবন্ধে প্রথম ‘ইকোক্রিটিসিজম’ শব্দটি ব্যবহার করেন। ১৯৯২ সালে পরিবেশবাদী সাহিত্যচর্চাকে এগিয়ে নিতে গবেষকরা মিলিতভাবে ASLE (The Association for the Study of Literature and Environment) নামে একটি সংস্থা গড়ে তোলেন। এই

সংস্থাটি নিয়মিত 'ASLE NEWS' এবং 'ISLE' (Interdisciplinary Studies in Literature and Environment) নামক গবেষণাপত্র প্রকাশের মাধ্যমে ইকোক্রিটিসিজমকে বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয় করে তুলেছে। তবে নব্বইয়ের দশক থেকেই মূলত অধ্যাপক Cheryll Glotfelty -র হাত ধরে এই পরিবেশবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রাতিষ্ঠানিক সূচনা ঘটে। পরবর্তীকালে অধ্যাপক Cheryll Glotfelty এবং Harold Fromm ১৯৯৬ সালে 'The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecology' নামক আকর গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন, যার মাধ্যমে এই তত্ত্বটি একটি সুসংহত রূপ লাভ করে। এই গ্রন্থের ভূমিকায় ইকোক্রিটিসিজমকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এইভাবে— "Simply put, ecocriticism is the study of the relationship between literature and the physical environment." [১] অর্থাৎ, নারীবাদী বা মার্কসবাদী তত্ত্বের মতো ইকোক্রিটিসিজমও সাহিত্যের একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি; যেখানে সমাজ বা অর্থনীতির বদলে মানুষের সাথে পরিবেশের সম্পর্কটিকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। ১৯৮৯ সালের আগে পর্যন্ত এই ধারণাটি মূলত 'প্রকৃতি বিষয়ক রচনা পাঠ' (The study of Nature writing) হিসেবে পরিচিত থাকলেও, বর্তমানে এটি বিশ্বজুড়ে সাহিত্যের একটি স্বতন্ত্র ও সমৃদ্ধ শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

পাশ্চাত্যের আধুনিক তাত্ত্বিক সংজ্ঞার বাইরে বাংলা সাহিত্যে পরিবেশগত চেতনার এক নিজস্ব ঐতিহ্য লক্ষ করা যায়। বিশেষত বৈদিক ভারতীয় সংস্কৃতিতে প্রকৃতির আরাধনা ও নিসর্গ-প্রীতির ধারা অতি প্রাচীনকাল থেকেই প্রবহমান। তবে আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার দাপটে বিপন্ন পরিবেশকে রক্ষা করার যে পরিবেশগত সচেতনতা, বাংলা সাহিত্যে তার সার্থক সূচনা ঘটে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে। 'বলাই', 'মুক্তধারা' বা 'রক্তকরবী'-র মতো রচনায় তিনি প্রকৃতির বিপন্নতা তুলে ধরেছেন। মানুষের সীমাহীন লোভের বিরুদ্ধে সতর্ক করে তিনি আমাদের শুনিয়েছেন বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের'আরণ্যক' (১৯৩৯) উপন্যাসে অরণ্য বিনাশ এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে অরণ্য সংরক্ষণের ইঙ্গিত পাই। এর নিরিখে ভাবীকালের পরিবেশ সংকটের আভাস মেলে। জীবনানন্দ দাশ তাঁর কবিতায় প্রাণিজগতের প্রতি মানুষের বিনাশী নিষ্ঠুর মানসিকতাকে প্রকাশ করেন এবং জটিল, বিপন্ন সময়কে অতিক্রম করার জন্য পরিবেশের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার উপর বিশেষ জোর দেন। বাংলা সাহিত্যে পরিবেশ সচেতনতার এক সুদীর্ঘ ঐতিহ্য থাকলেও কিন্নর রায় সেই ধারাকে এক নতুন ও তাত্ত্বিক উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। পরিবেশ দূষণ যে মানবজাতির অস্তিত্বের মারণব্যাধি—এই সত্যটি সর্বপ্রথম সার্থক শিল্পরূপ পায় কিন্নর রায়-এর লেখনীতে। ১৯৯০ সালে প্রকাশিত তাঁর 'প্রকৃতি পাঠ' উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক পরিবেশকেন্দ্রিক আখ্যান। নিছক নিসর্গ প্রেমের ঊর্ধ্বে উঠে তিনি পরিবেশের সর্বস্তরের দূষণ ও তার ভয়াবহতাকে সাহিত্যের মূল বিষয় করে তুলেছেন। এই ধারায় তিনি পরবর্তী সময়ে লিখেছেন 'মেঘপাতাল' (১৯৯৫), 'মৃত্যুকুসুম' (২০০৭), 'বিষকুম্ভ' (২০০৭), 'ব্রহ্মকমল' (২০০৯), 'হননঋতু' (২০১০) এবং 'ধূলিচন্দন' (২০১০) ইত্যাদি একের পর এক পরিবেশধর্মী উপন্যাস । তাঁর এই কাজগুলো বাংলা সাহিত্যে পরিবেশবাদী

চেতনার এক শক্তিশালী ভিত তৈরি করেছে। আমাদের বর্তমান আলোচনার মূল বিষয় হলো তাঁর অনন্য সৃষ্টি ‘ব্রহ্মকমল’ (২০০৯)।

আলোচ্য ‘ব্রহ্মকমল’ (২০০৯) উপন্যাসের মূল উপজীব্য হলো সমকালীন বিশ্বের অন্যতম প্রধান সংকট—নদী দূষণ ও তার অস্তিত্বের বিলোপ। পরিবেশ-সচেতন সাহিত্যিক হিসেবে কিন্নর রায় বরাবরই তাঁর লেখায় প্রকৃতি ও পরিবেশের বিচিত্র সমস্যাগুলিকে তুলে ধরেছেন, যেখানে নদীর ক্রম-অন্তর্ধানের বিষয়টি তাঁর প্রখর দৃষ্টি এড়ায়নি। আধুনিক যাপনের এক গভীর সমস্যা হলো নদ-নদীর অস্তিত্বের সংকট; যেখানে তথাকথিত সভ্যতার পলি পড়ে নদীগুলো আজ রুদ্ধশ্বাস, ক্রমে মানচিত্র থেকে মুছে যাওয়ার পথে। হাওড়া জেলায় দীর্ঘকাল বসবাসের অভিজ্ঞতায় লেখক বাল্যকাল থেকেই সরস্বতী নদীর প্রবাহহীনতা, ঘোলাটে জলধারা এবং তিলে তিলে তার মৃত্যু প্রত্যক্ষ করেছেন। পরবর্তী সময়ে নদী পুনর্জীবনের নামে প্রভূত সরকারি অর্থব্যয় ও বৃহৎ পরিকল্পনার ব্যর্থতাও তাঁর নজর কেড়েছে, যা মূলত সঠিক রূপরেখার অভাব এবং মানুষের সীমাহীন দূষণের ফলে প্রায়শই আলোর মুখ দেখে না। নদীদূষণের এই ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে প্রশাসন ও সাধারণ মানুষের নির্লিপ্ততা লেখককে গভীরভাবে ব্যথিত করায় তিনি আখ্যানের মোড়কে তুলে ধরেছেন মজা, ক্ষয়িষ্ণু, বিবর্ণ ও স্রোতহীন নদীদের এক করুণ উপাখ্যান। উপন্যাসের কথামুখ ‘নদীর জোয়ারে, কল্লোলে’ শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক স্বয়ং নদীকেই কাহিনীর একমাত্র ‘স্বপ্ন ও বাস্তব’ হিসেবে অভিহিত করে রুগ্ন নদীদের আর্তনাদকে একটি শিল্পরূপ দিতে চেয়েছেন। এই আখ্যানমঞ্জুরীতে বিশ্ব উষ্ণায়ন, জলবায়ু পরিবর্তন, কৃষিজমি ও ভূমি আন্দোলন, বিভিন্ন শ্রেণীর সামাজিক গোত্র বিন্যাস এবং উন্নয়নের প্রশ্নে দ্বিধাবিভক্ত ‘বুদ্ধিজীবী সমাজ’-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গগুলোও অত্যন্ত নিপুণভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। তবে এই বহুস্তরীয় আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট থাকা সত্ত্বেও, বর্তমান প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য হলো পরিবেশবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও পরিবেশগত বিপর্যয়ের দিকটি বিশ্লেষণ করা। অর্থাৎ, উপন্যাসে বর্ণিত নানাবিধ সামাজিক প্রসঙ্গের গভীরে না গিয়ে, কেবল নদী ও প্রকৃতির বিপন্নতা এবং তার ফলে মানুষের অস্তিত্বের সংকটটিকেই এখানে আলোচনার মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

কাহিনির শুরুতেই লেখক আধুনিক উন্নত সভ্যতার আগ্রাসী দূষণের এক বাস্তব চিত্র অঙ্কন করেছেন। সভ্যতার যান্ত্রিক অগ্রগতির সমান্তরালে মানুষ উত্তরোত্তর যন্ত্রনির্ভর হয়ে পড়ায় চতুর্দিকের পরিবেশে ছড়িয়ে দিচ্ছে বিষবাষ্প। বর্তমান নগরজীবনে যানবাহনের অনিয়ন্ত্রিত সংখ্যাবৃদ্ধি বায়ুদূষণ ও শব্দদূষণের মাত্রাকে চরমে নিয়ে গেছে। উপন্যাসে দেখা যায় ডোমজুড়ের সংকীর্ণ রাস্তায় আধ-পুরোনো ‘রূপছবি’ সিনেমা হলের সামনে দিয়ে মারুতি, অ্যামবাসাডর বা টাটা সুমোর মতো যানবাহনের অবিরাম ছুটে চলা কেবল যান্ত্রিক কোলাহলই বাড়ায় না, বরং নির্গত ধোঁয়া পরিবেশের স্বাভাবিক ভারসাম্য নষ্ট করে দিচ্ছে। এই তীব্র শব্দদূষণ একদিকে যেমন মানুষের শ্রবণশক্তি হ্রাস করছে, অন্যদিকে শিশু ও প্রবীণদের স্বাস্থ্যের ওপর ফেলছে মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব। লেখকের বর্ণনায় সেই দহন চিত্রটি এইরকম:

"অসহ্য গরম। জুন মাসের আকাশে মেঘের চিহ্নমাত্র নেই। খররোদে পুড়ে যায় গা-হাত। পা-মুখ। প্রায় সত্তর ছোঁয়া রাঘবেন্দ্র সান্যাল কিছুতেই গরম সহ্য করতে পারেন না। শীত যত পড়ে পড়ুক, অসুবিধে নেই। কিন্তু ভয়ানক কষ্ট হতে থাকে গরমে।"[২]

জলবায়ুর এই সংকট আজ এক সর্বজনীন সমস্যায় পরিণত হয়েছে। কলকারখানার বিষাক্ত ধোঁয়া ও অপরিশোধিত বর্জ্য পৃথিবীর রক্ষাকবচ ওজোন স্তরকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। মানুষ উন্নয়নের স্বার্থে যন্ত্রের ব্যবহার বাড়ালেও দূষণ রোধে চরম উদাসীন; এখানে সমষ্টিগত কল্যাণের চেয়ে ব্যক্তি স্বার্থই জয়ী হচ্ছে। মানুষের এই অসচেতনতার ফলে নির্গত বিষাক্ত গ্যাস বিশ্ব উষ্ণায়নকে বাড়িয়ে দিচ্ছে, যা আমাদের এই পৃথিবীকে ক্রমে বসবাসের অযোগ্য করে তুলছে। পরিবেশের এই চরম বিপর্যয় নিয়ে লেখকের সেই গভীর উদ্বেগের কথাই ফুটে ওঠে রাঘবেন্দ্র সান্যালের ভাবনায়:

"দিন দিন হচ্ছেটা কী? কী হচ্ছে? মানুষের তৈরি করা কল-কারখানার বিষ ধোঁয়া একটু একটু করে ফুটো করে দিয়েছে ওজোন স্তর। গরম হয়ে উঠছে পৃথিবী। সেই তাপে আস্তে আস্তে গলে যাচ্ছে মেরু-দেশের বরফ। চাপ বাড়ছে সমুদ্রে। গলে যাচ্ছে বরফ। বেশি চাপ আসছে সমুদ্রে। ফুলে উঠছে সাগর। এই আরও বেশি বেশি ফুঁসে ওঠা জলই কি এক সময় বয়ে নিয়ে আসবে মহাপ্লাবন!"[৩]

বিশ্ব উষ্ণায়নের এই ভয়াবহ প্রেক্ষাপটেই নদী-প্রেমী রাঘবেন্দ্র সান্যাল সরস্বতী নদীর মৃতপ্রায় অবস্থা দেখে বিমর্ষ হয়ে পড়েন। আধুনিক প্রযুক্তির দাপটে মানুষ নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রকৃতিকে নিরন্তর নিপীড়ন করে চলেছে। শহরের যাবতীয় দূষিত বর্জ্য ও আবর্জনা নদীর স্বাভাবিক স্রোতকে রুদ্ধ করে তাকে আজ এক সংকীর্ণ ও অগভীর নালায় পর্যবসিত করেছে। একসময়ের প্রমত্তা সরস্বতী আজ এতটাই মলিন যে, তার রুগ্ন জলধারায় রাঘবেন্দ্র নিজেকে ঠিকমতো দেখতে পারেন না। নদীর এই অবক্ষয়িত রূপ ও করুণ পরিণতি নিয়ে লেখক আক্ষেপ করেন –

"কত আর পারে নদী! আবর্জনা, সভ্যতার ক্লেদ বইতে বইতে একসময় নদী মরে যায়। তার স্রোতে জোয়ার-ভাটা নষ্ট হয়ে যায়। উথাল-পাথাল ভাব থাকে না। অথচ এই জলধারা বেয়েই একদিন বড় বড় কত পালতোলা নৌকোর বহর। বাণিজ্য যাত্রা। সওদাগরের আসা-যাওয়া। আনা-নেওয়া।"[৪]

সরস্বতী ছাড়াও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বিদ্যাধরী, খড়দা-সোদপুরের নোয়াই কিংবা কুন্তীর মতো বহু প্রবাহ আজ সভ্যতার আগ্রাসনে মানচিত্র থেকে বিলুপ্তির পথে। অথচ এই নদীমাতৃক দেশেই একদা এই জলধারাগুলোকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল সমৃদ্ধ নগরসভ্যতা। লেখকের মতে, নদীর মৃত্যু যে অনিবার্যভাবে মানবজাতির অন্তিমকাল ঘোষণা করে— "নদী হারিয়ে গেলে সভ্যতা মরে যায়। সভ্যতা মরে গেলে মানুষ মরে" [৫], তখন তা কেবল সাহিত্যিক হাহাকার থাকে না, বরং এক ধ্রুব ঐতিহাসিক সত্যে পরিণত হয়। ইতিহাসের পাতায় দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, সিন্ধু বা মেসোপটেমীয় সভ্যতার মতো শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতিগুলোর পতনের মূলে ছিল কোনো না

কোনো নদীর মৃত্যু বা গতিপথ পরিবর্তন। কিন্নর রায়ের এই জীবনদর্শন তাই বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক বাস্তবতারই এক শৈল্পিক প্রতিফলন।

উপন্যাসে লেখক বিভিন্ন নদীর ব্যক্তিত্বারোপিত (Personified) ও কাল্পনিক আত্মকথনের আশ্রয় নিয়ে আধুনিক সভ্যতার এক নির্মম ও আগ্রাসী রূপ তুলে ধরেছেন। নদী-প্রেমী রাঘবেন্দ্র সান্যালের সংবেদনশীল হৃদয়ে ধরা দিয়েছে সেইসব আর্তনাদ; যেখানে সরস্বতী, শ্রীমতী, মরালী, যমুনা, ইছামতী ও চূর্ণীর মতো নদীগুলো তাদের বর্তমান অস্তিত্বহীনতার হাহাকার ব্যক্ত করেছে। বিশেষ করে, 'দুই মজা নদীর কথোপকথন' অংশে লেখক মজে যাওয়া সরস্বতী ও মরালী নদীর মধ্যে এক কাল্পনিক সংলাপের অবতারণা করেছেন। এই সৃজনশীল বিনির্মাণের মধ্য দিয়ে নদী দুটির অতীতের প্রাচীন গৌরবগাথা এবং বর্তমানের হৃতসর্বস্ব রূপটি অত্যন্ত নিপুণভাবে পাঠকের সামনে উন্মোচিত হয়েছে।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিচারে, একদা পূর্ব ভারতের অন্যতম প্রধান বাণিজ্যিক ধমনী এবং হাওড়া-হুগলি অঞ্চলের সমৃদ্ধির ধারক ছিল এই সরস্বতী নদী। ডাচ ঐতিহাসিক ভ্যান ডেন ব্রুকের (Van den Broucke) ১৬৬০ সালে প্রণীত মানচিত্র এবং 'সার্ভে অফ ইন্ডিয়া' থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুসারে এর সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের প্রমাণ মেলে। মজে যাওয়া মরালী নদীর কাছে নিজের গৌরবোজ্জ্বল অতীতের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে সরস্বতী জানায় যে, বিশ্ববিখ্যাত পর্যটক ইবন বতুতা তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে এই নদীর তীরের সপ্তগ্রামের সমৃদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্রের কথা লিখে গেছেন। সেই সময়ে গন্ধবণিক, সুবর্ণবণিক ও তন্তুবায় সম্প্রদায়ের পদভারে মুখরিত এই জনপদে পর্তুগিজ বণিকরাও বড় বড় জাহাজে বাণিজ্য করতে আসতেন। সরস্বতীর এই বিষণ্ণ আত্মকথনে উঠে আসে হ্যামিলটন, কেরি সাহেব, ভেনিসিয়ান পর্যটক সিজার ফেদেরিসি থেকে শুরু করে আধুনিক কালের চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মনমোহন চক্রবর্তী, অমিয়কুমার বন্দোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এবং কালিদাস দত্তের মতো বিদগ্ধ গবেষকদের নাম। তাঁরা সবাই অ্যাকাডেমিক দৃষ্টিকোণ থেকে সরস্বতীর এই অতীত তাৎপর্য ও বিবর্তনকে স্বীকার করেছেন। অথচ আজ সেই প্রমত্তা সরস্বতী সংস্কারের অভাবে কেবল একটি শীর্ণ জলরেখা বা সংকীর্ণ নর্দমায় পরিণত হয়েছে। সরস্বতীর মুখে তার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস এবং বর্তমান করুণ পরিণতির কথা শুনে মরালী নদীর মর্মভেদী প্রশ্নটি এই সংকটের স্বরূপকে আরও স্পষ্ট করে তোলে –

মরালী — "এতদিনের বেড়ে যাওয়া, কত কত সভ্যতার ঐতিহ্য, দেশী-বিদেশী বণিকদের যাওয়া আসা, বহিত্র, নৌবহর, অনেক অনেক সুবর্ণমুদ্রার ঝনঝনানি, তবু তুমি হারিয়ে গেলে কেন সরস্বতী? কেন স্থির হয়ে গেলে প্রায়?"[৬]

নদীর এই অবক্ষয় কেবল সরস্বতীতেই সীমাবদ্ধ নয়। দিনাজপুরের শ্রীমতী আজ চাষের জমিতে রূপান্তরিত, চাকদহের মরালী নদী হারিয়েছে তার জীববৈচিত্র্য। উত্তর চব্বিশ পরগনার যমুনা নদী সম্পর্কে পঞ্চদশ শতকের

কবি বিপ্রদাস পিপিলাই-এর সেই 'যমুনা বিশাল অতি'—র বর্ণনা আজ এক করুণ বিপ্রতীপতায় (Irony) পর্যবসিত। বর্তমানে যমুনা কেবল স্মৃতির এক ক্ষীণ রেখামাত্র –

"কারা কারা যেন মুছে যাওয়া পুরনো স্রোত, নদীখাতের চিহ্ন ধরে রাখা বড় বড় দহের জল দেখিয়ে বলে, এখানে নদী ছিল। এই নদীপথ দিয়ে যেত বড় বড় নৌকো। কুমিরও দেখা যেত এখানে।"[৭]

ইছামতীর সংকটের মূলে রয়েছে মানুষের সীমাহীন লোভ ও নদী-দখলের অশুভ প্রতিযোগিতা (Illegal Encroachment)। নদীর বুকে পলি, অবৈধ ইটভাটা আর কচুরিপানার জটলা ইছামতীকে এক রুগ্ন সত্তায় পরিণত করেছে। উপন্যাসে উঠে এসেছে প্রশাসনিক স্থবিরতা ও রাজনৈতিক অনীহার চিত্র, যেখানে ইছামতী রাঘবেন্দ্রকে জানায়— 'নদী আমার দায়িত্বে নয় '—এই অজুহাতে স্থানীয় প্রশাসন ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ নদী বুজিয়ে ফেলার অমানবিক দৃশ্য দেখেও নীরব থাকেন।

নদী দূষণের এই অভিশাপ আন্তর্জাতিক ভৌগোলিক সীমানাকেও (Transboundary Pollution) ছাড়িয়ে গেছে। চূর্ণী ও মাথাভাঙা নদীর জল বাংলাদেশে স্থিত চিনির কলের বর্জ্যে বিষাক্ত হয়ে কালো হয়ে গেছে, যার ফলে বিপন্ন হচ্ছে জীববৈচিত্র্য ও মৎস্যজীবীদের জীবনজীবিকা:

"ভারত-বাংলাদেশ বর্ডারে মাজদিয়া থেকে শিবপুর—এই নদীর জল পচে গিয়ে খুব খারাপ গন্ধ বেরচ্ছে... আসলে বাংলাদেশের দর্শনার কেরো সুগার মিলের জল ঢুকে পড়েছে নদীতে।"[৮]

উপন্যাসের এই পরিবেশবাদী বয়ান থেকে স্পষ্ট হয় যে, মানুষের সচেতনতার অভাব এবং বাস্তুতান্ত্রিক অদূরদর্শিতা (Ecological Myopia) আইন দিয়েও ঠেকানো সম্ভব হচ্ছে না। প্রকৃতির এই প্রাণস্পন্দনের অবলুপ্তি মানে কেবল জলাশয়ের বিনাশ নয়, বরং খাদ্যশৃঙ্খল ও জীববৈচিত্র্যের ভারসাম্য নষ্ট হওয়া, যা চূড়ান্ত পর্যায়ে মানবজাতির অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলবে।

নদীর অস্তিত্বহীনতার সমান্তরালে লেখক আধুনিক সভ্যতার এক অন্ধকার দিক—বন্যপ্রাণী নিধন বা অবৈধ শিকারের (Poaching) প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, কঠোর বিধিনিষেধ প্রণয়ন করে যেমন নদীদূষণ রোধ করা যাচ্ছে না, তেমনি প্রশাসনিক তৎপরতা নিয়মিত চললেও এই অপরাধ ঠেকানো সম্ভব হচ্ছে না। এই সমস্যার কথা বলতে গিয়েই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র রাঘবেন্দ্র সান্যাল আক্ষেপ করে বলেন—

"ওসব তো কাগজে-কলমে। নিষিদ্ধ করলেই বা শুনছে কে? মানছেই বা কারা? এই তো সেদিন সুন্দরবনে একটা চিতল হরিণ মেরে পাচার করা হচ্ছিল বাংলাদেশে। বলেই বড় করে শ্বাস ফেললেন রাঘবচন্দ্র।"[৯]

বর্তমানে এই নিষিদ্ধ বাণিজ্যের নেটওয়ার্ক সর্বত্র বিস্তৃত। শুধু সুন্দরবনের বাঘ বা চিতল হরিণই নয়, কাজিরাঙার গন্ডার, কানহা, সারিস্কা বা মানসের বাঘ—কেউই এই সংগঠিত অপরাধচক্রের হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে না। আইনি রক্ষাকবচ, বনরক্ষক বা লেখালেখি—কোনো কিছুর দ্বারাই এই নিধনযজ্ঞ আটকানো যাচ্ছে না; কারণ

এই চোরাশিকারিরা অত্যন্ত শক্তিশালী এবং এদের সাথে কোথাও কোথাও উগ্রপন্থী গোষ্ঠীগুলোর সংশ্রবও পরিলক্ষিত হয়।

উপন্যাসে সরস্বতী নদীকে দূষণমুক্ত করার লক্ষ্যে পরিবেশ সচেতন চরিত্র শ্যামল চক্রবর্তী, প্রবীণ নদী-প্রেমী রাঘবেন্দ্র সান্যালকে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁদের এই সম্মিলিত উদ্যোগ কেবল ব্যক্তিগত আবেগের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং তা একটি সংগঠিত সামাজিক আন্দোলনের রূপ নিয়েছে। মেধা পাটেকরের প্রখ্যাত 'নর্মদা বাঁচাও' আন্দোলনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁরা 'সরস্বতী বাঁচাও কমিটি' গঠন করেন। এই কমিটির সদস্যরা নদী রক্ষায় রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সেচ দপ্তর এবং প্রশাসনের নীতি-নির্ধারকদের ওপর চাপ সৃষ্টির পাশাপাশি একটি বৃহত্তর গণ-আন্দোলনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। তবে নদী বাঁচাতে এই জাতীয় জন-উদ্যোগ অনেক সময় সঠিক কর্মকৌশল ও বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার অভাবে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পায় না। আধুনিক উন্নয়নমুখী সভ্যতায় নদী সংস্কার, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন বা জল সংরক্ষণের অজুহাতে জলধারাকে কৃত্রিম বাঁধের শিকলে বেঁধে মানুষ প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির স্বাভাবিক ভারসাম্যই বিঘ্নিত করছে।

এর এক ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত হিসেবে ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকে কলকাতা বন্দরের নাব্যতা রক্ষার উদ্দেশ্যে নির্মিত ফারাক্কা বাঁধের প্রসঙ্গটি উঠে এসেছে। পরিকল্পনা ও গঠনগত ত্রুটির কারণে গঙ্গায় বিপুল পলি জমে নদীর গভীরতা হ্রাস পেয়েছে, যার ফলশ্রুতিতে মালদহ ও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে ভয়াবহ বন্যা ও নদীভাঙন আজ এক নিত্যনৈমিত্তিক দুর্যোগে পরিণত হয়েছে। প্রখ্যাত নদীবিজ্ঞানী কপিল ভট্টাচার্য এই অদূরদর্শী প্রকল্পের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই কৃত্রিম নিয়ন্ত্রণ নদীর স্বতঃস্ফূর্ত চলন ও অভিমুখকে আটকে দিয়ে এর মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করবে। দুর্ভাগ্যবশত, তৎকালীন সময়ে তাঁর বৈজ্ঞানিক সত্যকে রাজনৈতিক সংকীর্ণতার কারণে অবজ্ঞা করা হয়েছিল এবং তাঁকে 'পাকিস্তানের দালাল' বলে লাঞ্ছিত করা হয়। লেখকের মতে, নদীকে শাসন করার পরিবর্তে প্রাকৃতিক বৃষ্টির জল ধরে রাখার জন্য ছোট ছোট জলাধার বা পুকুর খননের মতো টেকসই পদ্ধতি (Sustainable Methods) অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়। কিন্নর রায় আধুনিক সভ্যতার উন্নয়নের বিরোধী নন; বরং তিনি তথাকথিত উন্নয়নের নামে যে 'বাস্তুতান্ত্রিক বিপর্যয়' ঘটছে, সেই বিষয়ে পাঠকদের সচেতন করতে চেয়েছেন।

নদীর সংকটের এই স্থানীয় প্রেক্ষাপটকে লেখক এক বৃহত্তর বৈশ্বিক সংকটের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। তাঁর মতে, বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন রাষ্ট্র যে আগ্রাসী নীতি গ্রহণ করেছে, তা একসময় মানবসভ্যতাকে যুদ্ধের মাধ্যমে ধূলিসাৎ করে দেবে। যুদ্ধে কেবল মানুষের প্রাণহানি ঘটে না, বরং প্রকৃতির বিনাশ ও সভ্যতার অপমৃত্যু ঘটে। লেখক উল্লেখ করেছেন যে, আফগানিস্তানে সামরিক অভিযানের ফলে যে বায়ুদূষণ হচ্ছে, তা দক্ষিণ এশিয়ার ঋতুবৈচিত্র্যের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলছে। ভারত একটি কৃষিপ্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও জলবায়ু পরিবর্তনের

(Climate Change) কারণে জুন মাসের নির্দিষ্ট সময়ে আর বর্ষা নামছে না। এ বিষয়ে শ্যামল চক্রবর্তী তাঁর গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে জানিয়েছেন—

"আস্তে আস্তে তাপমাত্রা বাড়ছে পৃথিবীর। একটু একটু করে গরম হয়ে উঠছে ভূপৃষ্ঠ। তার ফলাফল আমরা এখনই টের পাচ্ছি না ঠিক মতো... এভাবে চলতে থাকলে স্থির ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাবে পৃথিবী... গ্রীনহাউস এফেক্ট নিয়ে বলা হচ্ছে এত কথা, কত বড় বড় সেমিনার... কিন্তু কাজের কাজটি হচ্ছে কোথায়? সে ব্যাপারে তো যাকে বলে একেবারে লবডঙ্কা।"[১০]

পরিবেশ দূষণ রোধের আড়ালে লেখক আধুনিক বিশ্বের এক চরম পরিবেশগত বৈষম্য (Environmental Injustice) উন্মোচন করেছেন। তিনি দেখান যে, প্রথম বিশ্বের (First World) উন্নত রাষ্ট্রসমূহ যখন বিপুল অর্থ ব্যয়ে ইকো-সিস্টেম সুরক্ষা ও বৈজ্ঞানিক কর্মসূচি গ্রহণ করছে, ঠিক তখনই তারা নিজেদের শিল্পোন্নত সভ্যতার বর্জ্য অপসারণের জন্য তৃতীয় বিশ্বের (Third World) দেশগুলোকে 'ডাম্পিং গ্রাউন্ড' হিসেবে ব্যবহার করছে। এই দ্বিমুখী নীতির ফলে বিশ্ব উষ্ণায়ন বা 'Global Warming' আজ এক অপ্রতিরোধ্য সংকটে পরিণত হয়েছে। ভূমণ্ডলের এই ক্রমবর্ধমান উত্তাপের প্রভাবে মেরু অঞ্চলের বরফ, হিমশৈল এবং পার্বত্য হিমবাহ আশঙ্কাজনক হারে গলতে শুরু করেছে। ভূবিজ্ঞানীদের পূর্বাভাস অনুযায়ী, এই ক্রমবর্ধমান জলস্তর বৃদ্ধি অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীতে এক প্রলয়ঙ্করী মহাপ্লাবন ও সুনামির আশঙ্কা তৈরি করছে। ২০০৪ সালের ২৬ ডিসেম্বরের সেই ভয়াবহ সুনামির ধ্বংসলীলা—যাতে আন্দামান, চেন্নাই, শ্রীলঙ্কা ও ইন্দোনেশিয়াসহ ১৪টি দেশের প্রায় ২ লক্ষ ৩০ হাজার মানুষের প্রাণহানি ঘটেছিল এবং যার আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ছিল প্রায় ১,৫০০ কোটি মার্কিন ডলার—তা মূলত প্রকৃতির ওপর মানুষের সীমাহীন অত্যাচারেরই প্রতিফলন। লেখক পৌরাণিক ও ধর্মীয় অনুষঙ্গ ব্যবহার করে সতর্ক করেছেন যে, দ্বারকা নগরী রক্ষার ব্যর্থতা বা মৎস্যাবতার ও নূহ নবীর অনুপস্থিতি আজ এটাই প্রমাণ করে যে—মানুষের শুভবুদ্ধি ও সচেতনতা ছাড়া পৃথিবীকে রক্ষা করার আর কোনো অতিপ্রাকৃত শক্তি নেই।

জলবায়ু পরিবর্তনের এই বৈশ্বিক সংকট মোকাবিলায় ১৯৮৮ সালে জাতিসংঘ এবং বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (WMO) কর্তৃকগঠিত Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) -এর প্রতিবেদন অত্যন্ত উদ্বেগজনক। তাঁদের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী, দূষণের এই ধারা অব্যাহত থাকলে ২১০০ সালের মধ্যে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা ১.৪ থেকে ৫.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়তে পারে ২০ থেকে ৮৮ সেমি পর্যন্ত। বিশ্ব উষ্ণায়ন সংক্রান্ত এই চরম বিপদের বিষয়ে World Meteorological Organization (WMO) পুনশ্চ সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছে:

"আগামী ৫ বছরে বার্ষিক গড় বৈশ্বিক তাপমাত্রা সাময়িকভাবে ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস পৌঁছানোর '৫০:৫০ সম্ভাবনা' রয়েছে। জাতিসংঘের আবহাওয়া (আবহাওয়া ও জলবায়ু) বিষয়ক সংস্থা কর্তৃক জারি করা নতুন জলবায়ু

আপডেটে WMO বলেছে যে ২০২২—২০২৬-এর মধ্যে অন্তত এক বছরের রেকর্ড সবচেয়ে উষ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৯৩ শতাংশ।"[১১]

লক্ষণীয় যে, কিন্নর রায়ের 'ব্রহ্মকমল' উপন্যাসটি ২০০৯ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থটি প্রকাশের দেড় দশক অতিক্রান্ত হওয়ার পর বর্তমান সময়ের চরম বাস্তুতান্ত্রিক সংকট যখন আমরা প্রত্যক্ষ করছি, তখন স্পষ্ট বোঝা যায় যে লেখক দেড় দশকেরও বেশি সময় আগে এক দূরদর্শী দ্রষ্টার ন্যায় মানবজাতিকে এই আসন্ন মহাবিপর্যয় সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন। সভ্যতার যান্ত্রিক উল্লাসে মানুষের প্রকৃতি-বিমুখতা আজ সেই সতর্কবাণীকেই রূঢ় বাস্তবতায় পরিণত করেছে।

উপন্যাসে লেখক আমাদের এমন একদল মানুষের সঙ্গে পরিচয় করিয়েছেন, যাঁদের অস্তিত্ব ও সত্তা নদীর সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। রাঘবেন্দ্র সান্যাল, ছোটকু ভট্টাচার্য, ভূগোল শিক্ষক সোমেশ্বর চন্দ, নদী-বিজ্ঞানী অধ্যাপক প্রমথনাথ মাইকাপ এবং কেদার বখিলের মতো চরিত্রগুলো কেবল সাধারণ মানুষ নন, বরং তাঁরা প্রকৃতি-লগ্ন জীবনবোধের (Ecocentric perspective) এক একটি অনন্য উদাহরণ। ছোটকু ভটচার্যের চরিত্রটির মধ্য দিয়ে লেখক এক ধরণের আধিভৌতিক বিশ্বাস ও আশাবাদ তুলে ধরেছেন; যেখানে সে মৃত সরস্বতী নদীর পুনরুজ্জীবনের আশায় প্রতিদিন নিয়ম করে নদীর বুকে সাতটি মাটির প্রদীপ প্রজ্বলন করেন। এই প্রদীপ প্রজ্বলন কেবল ধর্মীয় আচার নয়, বরং তা মৃতপ্রায় প্রকৃতির প্রতি মানুষের মমত্ববোধ ও লড়াইয়ের এক শক্তিশালী রূপক। অন্যদিকে, কেদার বখিলের মতো সাধারণ মানুষেরা প্রথাগত নদী-বিজ্ঞানীদের চেয়েও নদীকে অনেক বেশি গভীরভাবে অনুভব করেন। তাঁদের এই সহজাত জ্ঞান (Indigenous Knowledge) এবং নদীর প্রতি নিঃস্বার্থ ভালোবাসা এটাই প্রমাণ করে যে, কেবল পুঁথিগত বিদ্যা বা আধুনিক প্রযুক্তিতে নয়, বরং মানুষের সংবেদনশীল চেতনার মাধ্যমেই প্রকৃতির বিপন্ন অস্তিত্বকে রক্ষা করা সম্ভব। মূলত এই 'নদী-পাগল' মানুষদের অবিরাম স্বপ্ন আর সংগ্রামের জন্যই আজ সভ্যতার আগ্রাসনের মুখেও নদীগুলোর অস্তিত্বের শেষ চিহ্নটুকু টিকে আছে।

উপন্যাসের চরম পরিণতিতে এক চমৎকার মনস্তাত্ত্বিক বিনিময় (Psychological Interchange) লক্ষ করা যায়, যেখানে নদী ও মানুষ একে অপরের অস্তিত্বে বিলীন হয়ে যায়। সাধারণত মানুষ নদীকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে, কিন্তু এখানে মৃতপ্রায় সরস্বতী নদী খোদ নদী-প্রেমী রাঘবেন্দ্র সান্যালকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে। নোংরা ও ময়লাজলের ধারা নিয়ে থমকে থাকা সরস্বতী তার স্বপ্নে রাঘবেন্দ্রকে এক ভিন্নরূপে প্রত্যক্ষ করে:

> "সরস্বতী নদী তার স্বপ্নে দেখতে পেল শাদা– ঠিক শাদা নয়, জল রঙের প্লাস্টিকে খুব ভালো করে আপাদমস্তক মোড়া রাঘবেন্দ্র সান্যালকে। সান্যাল মশাইয়ের দুটি চোখই বোজা। হাত দুটো টানটান করে সেঁটে রাখা গায়ের সঙ্গে। এবার একটা পাতলা মতো ঢেউ কোথা থেকে যেন উড়ে এল।... প্লাস্টিকমোড়া, তার ওপর দড়ি দিয়ে বাধা রাঘবেন্দ্রকে ছলছল জল ঢেউ হয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে গেল"[১২]

এই শক্তিশালী রূপকের মাধ্যমে লেখক এক রূঢ় সত্য প্রকাশ করেছেন—মানুষ আজ প্রকৃতিকে যে দূষণের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করছে, অদূর ভবিষ্যতে সেই কৃত্রিম আবর্জনা ও প্লাস্টিকই মানুষের স্বাভাবিক নিশ্বাস রুদ্ধ করবে। রাঘবেন্দ্র সান্যাল এখানে কেবল একজন ব্যক্তি নন, বরং তিনি সমগ্র মানব সভ্যতার প্রতিনিধি, যাকে প্লাস্টিক তথা যান্ত্রিক সভ্যতার বর্জ্য আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। এটি মূলত সভ্যতার আত্মঘাতী পরিণতির এক নান্দনিক ও তাত্ত্বিক সতর্কবার্তা।

তবে এই ধ্বংসাত্মক আশঙ্কার অন্ধকারের মধ্যেও লেখক এক নির্মল ও দূষণমুক্ত আগামীর ইঙ্গিত দিয়েছেন। উপন্যাসের পরিসমাপ্তিতে সরস্বতী নদী নিজেই এক নতুন ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে, যেখানে আধুনিক সভ্যতার কোনো ক্লেদ অবশিষ্ট নেই:

> "সরস্বতী দেখছে তার গায়ের সঙ্গে জড়তা সেই ময়লাটে, অপরিচ্ছন্ন স্রোত আর নেই। নোংরা, ক্লেদ, প্লাস্টিকের ক্যারি ব্যাগ, হাবরযাবর, হাবিজাবি—কিছুই তো আর নেই। জলের সঙ্গে যেসব দূষণ ভেসে ভেসে আসে, তারা কোথায়, কখন যেন উঠে গেছে। জল বড় নির্মল, কাচ কাচ। সুন্দর। সেখানে মেঘের ছায়া, পাখির ছায়ারূপ, আলোর ছায়াভাস। সূর্য-চন্দ্র-তারাদের সমবেত করতালি।"[১৩]

এই বর্ণনায় সরস্বতী কেবল একটি নদী নয়, বরং পুনরুজ্জীবিত প্রকৃতির এক শাশ্বত প্রতীকে পরিণত হয়েছে। যেখানে নদীটি তার স্বাভাবিক প্রবাহ, নির্মলতা এবং প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে পাওয়ার প্রত্যাশায় উন্মুখ।

পরিশেষে বলা যায়, কিন্নর রায়ের 'ব্রহ্মকমল' কেবল একটি নদী-কেন্দ্রিক আখ্যান নয়; বরং যান্ত্রিক সভ্যতার দাপটে প্রকৃতি আজ যে বিপন্নতার মুখোমুখি, এই উপন্যাস তারই এক সার্থক শিল্পরূপ। লেখক এখানে নদীকে কেবল জড় জলধারা বা নিসর্গের অনুষঙ্গ হিসেবে দেখেননি, বরং তাকে একটি 'জীবন্ত সত্তা' (Living Entity) হিসেবে উপস্থাপন করেছেন, যার অস্তিত্বের সংকটের সঙ্গে মানব সভ্যতার বিনাশ সরাসরি সম্পৃক্ত। উপন্যাসে চিত্রিত নদীদূষণ, বিশ্ব উষ্ণায়ন এবং চোরাশিকারের মতো সমস্যাগুলো মূলত মানুষের সীমাহীন লালসা এবং 'Anthropocentric' বা মানবকেন্দ্রিক আধিপত্যবাদেরই বিষময় ফল। তবে লেখক কেবল সংকটের চিত্রায়ন করেই ক্ষান্ত হননি; ছোটকু ভটচার্যের প্রদীপ প্রজ্বলন কিংবা রাঘবেন্দ্র সান্যালের নদী-প্রেমের মধ্য দিয়ে তিনি এক গভীর পরিবেশগত সংবেদনশীলতার বার্তা দিয়েছেন। প্রকৃতির সুরক্ষা ও বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য বজায় রাখা কোনো দয়া নয়, বরং তা মানবজাতির আত্মরক্ষারই এক মৌলিক দায়বদ্ধতা। বর্তমান বৈশ্বিক জলবায়ু সংকটে কিন্নর রায়ের এই পরিবেশবাদী সতর্কবার্তা প্রতিটি সচেতন মানুষের কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ দিকদর্শনহয়ে উঠেছে।

তথ্যসূত্র:

১. Glotfelty, Cheryll, and Harold Fromm, editors. The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecology. University of Georgia Press, 1996, p. xviii.

২. রায়, কিন্নর। ব্রহ্মকমল। দে'জ পাবলিশিং, ২০০৯, পৃ. ৯।

৩. রায়, পৃ. ১১।

৪. রায়, পৃ. ১২।
৫. রায়, পৃ. ১৫।
৬. রায়, পৃ. ২২।
৭. রায়, পৃ. ২৩।
৮. রায়, পৃ. ৪০-৪১।
৯. রায়, পৃ. ১৯।
১০. রায়, পৃ. ৩৫।
১১. "Temperature surge in next five years increasingly harmful, warns WMO." Zee News, ১৯মে২০২৩, https://zeenews.india.com/bengali/nation/temperature-surge-in-next-five-years-increasingly-harmful-warns-wmo_431030.html।
১২. রায়, কিন্নর। ব্রহ্মকমল। দে'জ পাবলিশিং, ২০০৯, পৃ. ৩৫৯।
১৩. রায়, পৃ. ৩৬০।